ইউনিট ১২

উদ্ভিদ প্রজনন
(PLANT REPRODUCTION)

ভূমিকা

প্রজনন জীবের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য। জড় বস্তুর প্রজনন ক্ষমতা নেই। প্রজনন না ঘটলে জীবের অস্তিত্ব থাকত না। ইহা এমন এক শারীরতত্ত্বীয় কার্যক্রম যার মাধ্যমে জীব তার প্রতিরূপ সৃষ্টি করে ভবিষ্যৎ বংশধর ধরে রাখে। যে প্রক্রিয়ায় কোন জীব তার বংশধর সৃষ্টি করে তাকে প্রজনন বলা হয়। জীবভেদে প্রজনন প্রক্রিয়া বিভিন্ন রকম হতে পারে। এ ইউনিটে উদ্ভিদের প্রজনন প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ০২ সপ্তাহ
এ ইউনিটের পাঠসমূহ	
পাঠ ১২.১ : বিভিন্ন প্রকার প্রজনন প্রক্রিয়া	
পাঠ ১২.২ : বিভিন্ন প্রকার প্রজনন প্রক্রিয়ার মধ্যে তুলনা	
পাঠ ১২.৩ : কৃত্রিম প্রজননের ধারণা	
পাঠ ১২.৪ : উদ্ভিদের সংকরায়ন	
পাঠ ১২.৫ : কৃত্রিম প্রজননের গুরুত্ব	

পাঠ-১২.১ বিভিন্ন প্রকার প্রজনন প্রক্রিয়া

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- প্রজনন সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- বিভিন্ন প্রকার প্রজনন প্রক্রিয়া উল্লেখ করতে পারবেন।
- বিভিন্ন প্রকার প্রজনন প্রক্রিয়া বর্ণনা করতে পারবেন।

☑	**প্রধান শব্দ**	যৌন প্রজনন, অযৌন প্রজনন

প্রজনন : প্রজনন জীবের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য। জড় বস্তুর প্রজনন ক্ষমতা থাকে না। মাতৃ জীব থেকে নতুন জীব সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে বলা হয় প্রজনন। প্রতিটি জীবেরই তার নিজের অনুরূপ বংশধর সৃষ্টির প্রাকৃতিক ব্যবস্থা রয়েছে। প্রজননের ফলে আমের বীজ থেকে এক সময় আম গাছ, লিচুর বীজ থেকে লিচু গাছ পাই। একইভাবে কলা গাছের গোড়া থেকে এক সময় কলা গাছ পাই। শিমুল, সজিনা, মাদার, জীয়ল ইত্যাদি গাছের ডাল কেটে মাটিতে লাগালে তা সজীব হয় এবং এক সময় পূর্ণাঙ্গ গাছে পরিণত হয়। অনুরূপভাবে পাঁথরকুচির পাতা মাটিতে ফেলে রাখলে তার কিনার থেকে নতুন পাঁথরকুচি চারা সৃষ্টির মাধ্যমে এক সময় পূর্ণাঙ্গ পাঁথরকুচি উদ্ভিদ পাওয়া যায়। তাই বলা যায়, প্রজনন একটি শারীরতাত্ত্বিক প্রক্রিয়া যে প্রক্রিয়ায় জীব তার নিজের ন্যায় অপত্য বংশধর সৃষ্টি করে।

প্রজননের প্রকারভেদ : উদ্ভিদ বিভিন্ন উপায়ে প্রজনন সম্পন্ন করে থাকে। তবে উদ্ভিদে প্রজনন প্রধানত দু'প্রকার। যথা- (ক) যৌন প্রজনন এবং (খ) অযৌন প্রজনন।

(ক) যৌন প্রজনন- দুটি ভিন্ন প্রকৃতির যথা পুং ও স্ত্রী জনন কোষ বা গ্যামিট পরস্পরের সাথে মিলিত হয়ে যে প্রজনন সম্পন্ন করে তাকে যৌন প্রজনন বলা হয়। এদের একটিকে পুং জনন কোষ (শুক্রাণু) ও অন্যটিকে স্ত্রী জনন কোষ (ডিম্বাণু) বলা হয়। এ দু'ধরনের জনন কোষ একই ফুলে বা একই দেহে সৃষ্টি হয়। উন্নত উদ্ভিদে এ দু'ধরনের জনন কোষ একই উদ্ভিদদেহে সৃষ্টি হয়। এদেরকে সহবাসী উদ্ভিদ বলা হয়। যখন দু'ধরনের জনন কোষ আলাদা আলাদা উদ্ভিদ দেহে সৃষ্টি হয় তখন সে উদ্ভিদকে ভিন্নবাসী উদ্ভিদ বলা হয়। যৌন প্রজননের মাধ্যমে সবীজী উদ্ভিদে বীজ তৈরি হয় তাই বীজ দ্বারা বংশবৃদ্ধি প্রক্রিয়াই যৌন প্রজনন। আবৃতবীজী উদ্ভিদের যৌন প্রজনন উওগ্যামাস প্রকৃতির হয়।

পরাগরেণুর পরিস্ফুটন : সপুষ্পক উদ্ভিদের পুংজননাঙ্গ বলতে পুংস্তবকের প্রত্যেকটা পুংকেশর (Stamen) কে বুঝায়। পুংস্তবকে এক বা একাধিক পুংকেশর থাকে। প্রত্যেকটি পুংকেশরের নিচে দন্ডাকার পুংদন্ড (Filament) এবং মাথায় স্ফীত পরাগধানী (Anther) থাকে। পরাগধানীর দু'খন্ডের মধ্যবর্তী অংশকে যোজনী (Connective) বলে।

পরিণত পরাগধানী অনেকটা চার কোণাকার। প্রতিটা কোণের ভেতরের দিকের কিছু কোষ আশেপাশের কোষ থেকে আকারে বড় হয়। এ সমস্ত কোষে বড় নিউক্লিয়াস ও ঘন সাইটোপ্লাজম থাকে। এসব কোষকে আর্কিস্পোরিয়াল (Archesporial) বা আদি অণুবীজ কোষ বলে। প্রজাতিভেদে এ কোষের সংখ্যা এক বা একাধিক হতে পারে। আর্কিস্পোরিয়াল কোষ বিভাজিত হয়ে দু'ধরনের কোষ উৎপন্ন করে। যথা– পরিধির দিকে দেয়াল কোষ এবং কেন্দ্রের দিকে প্রাথমিক জনন কোষ। দেয়াল কোষ পরে ৩-৫ স্তরবিশিষ্ট প্রাচীর গঠন করে। প্রাচীর বেষ্টিত থলির ন্যায় অংশকে পরাগথলি (Pollen sac) বলে।

প্রাথমিক জনন কোষ সরাসরি পরাগ মাতৃ কোষ (Pollen mother cell) হিসেবে কাজ করতে পারে অথবা বিভাজিত হয়ে অনেকগুলো পরাগ মাতৃ কোষ সৃষ্টি করতে পারে। পরাগ মাতৃ কোষে তখন মায়োসিস বিভাজন ঘটে, ফলে প্রতিটি ডিপ্লয়েড (2n) পরাগ মাতৃ কোষ থেকে চারটি হ্যাপ্লয়েড (n) পরাগরেণুর সৃষ্টি হয়। দেয়াল কোষ দ্বারা সৃষ্ট প্রাচীরের সবচেয়ে ভেতরের স্তরকে ট্যাপেটাম (Tapetum) বলে, যা বিগলিত হয়ে পরিস্ফুটিত পরাগরেণুর পুষ্টি সাধন করে। পরাগ মাতৃ কোষ হতে সৃষ্ট চারটি পরাগরেণু বিভিন্ন প্রজাতিতে বিভিন্নভাবে সাজানো থাকে, তবে পরিণত অবস্থায় পরাগরেণুগুলো পরস্পর হতে আলাদা হয়। Orchidaceae, Asclepiadaceae এসব পরিবারের উদ্ভিদের পরাগরেণুগুলো এক সাথে অবস্থান করে। পরাগরেণুর এ বিশেষ গঠনকে পলিনিয়াম (Pollinium) বলে।

পরাগরেণুর গঠন : পরাগরেণু সাধারণত গোলাকার হয় এবং এদের ব্যাস ০.০২৫-০.২৫ মিমি পর্যন্ত হতে পারে। প্রতিটি পরাগরেণুর দুটি করে ত্বক থাকে। বাইরের ত্বকটি কিউটিনযুক্ত এবং পুরু, একে বহিঃত্বক (Exine) বলে। বহিঃত্বক বিভিন্নভাবে অলংকৃত (Ornamented) থাকে। ভেতরের ত্বক অপেক্ষাকৃত পাতলা এবং সেলুলোজ নির্মিত, একে অন্তঃত্বক (Intine) বলে। পরাগরেণুর সাইটোপ্লাজম থাকে ঘন এবং প্রাথমিক অবস্থায় নিউক্লিয়াস কেন্দ্রে অবস্থান করে। পরাগরেণু বৃদ্ধি পেলে তার ভেতরে কোষ গহবর সৃষ্টি হয়, তখন নিউক্লিয়াস কোষ প্রাচীরের দিকে সরে যায়।

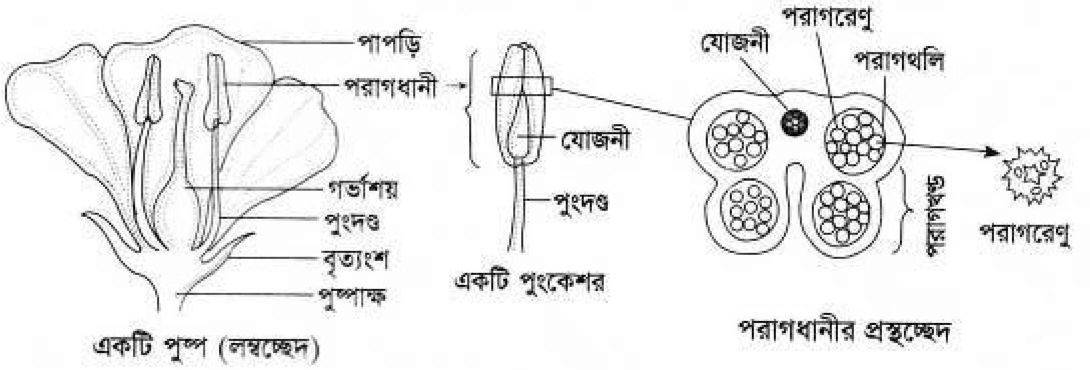
পাপড়ি
পরাগধানী
গর্ভাশয়
পুংদণ্ড
বৃত্যাংশ
পুষ্পাক্ষ
একটি পুষ্প (লম্বচ্ছেদ)
যোজনী
পুংদণ্ড
একটি পুংকেশর
পরাগরেণু
যোজনী
পরাগথলি
পরাগথলি
পরাগরেণু
পরাগধানীর প্রস্থচ্ছেদ

চিত্র ১২.১.১ : একটি আদর্শ ফুলের বিভিন্ন অংশ এবং পরাগধানীর প্রস্থচ্ছেদ

পুংগ্যামিটোফাইট (Male gametophyte) : পরাগরেণু হচ্ছে পুংগ্যামিটোফাইটের প্রথম কোষ। পরাগরেণুর হ্যাপ্লয়েড (n) নিউক্লিয়াসটি মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হয়ে দুটি অসম নিউক্লিয়াস গঠন করে। এদের বড়টিকে বলা হয় নালিকা নিউক্লিয়াস (Tube nucleus) এবং ছোটটিকে বলা হয় জনন নিউক্লিয়াস (Generative nucleus)।

পরাগধানীর প্রাচীর ফেঁটে গেলে সাধারণত এ দ্বি-নিউক্লিয়াসযুক্ত পরাগরেণু বাইরে বেরিয়ে আসে। এ পরাগরেণু বিভিন্ন বাহকের মাধ্যমে স্ত্রীকেশরের গর্ভমুন্ডে পতিত হয় এবং পরাগায়ন ঘটায়। পরাগায়নের পর পরাগরেণু অঙ্কুরিত হয় অর্থাৎ অন্তঃত্বক বৃদ্ধি পেয়ে জার্মপোর (পরাগরেণুর বহিঃত্বকে অবস্থিত পাতলা ছিদ্র) দিয়ে নালিকার ন্যায় বাড়তে থাকে। অঙ্কুরিত পরাগরেণুর এ নালিকাকে পরাগ নালিকা বা পোলেন টিউব (Pollen tube) বলে। পরাগ নালিকার ভেতরে প্রথমে নালিকা নিউক্লিয়াস এবং পরে জনন নিউক্লিয়াস প্রবেশ করে। পরাগ নালিকাটি গর্ভদন্ডের ভেতর দিয়ে ক্রমশ বাড়তে থাকে এবং শেষে গর্ভাশয়ের ভেতরে ডিম্বক রন্ধ্র পর্যন্ত পৌঁছায়। ইতিমধ্যে জনন নিউক্লিয়াসটি মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হয়ে দুটি পুংগ্যামিট (Male gamete) বা শুক্রাণু সৃষ্টি করে। পরাগরেণু, পরাগনালিকা, পুংগ্যামিট এগুলোর সমন্বয়ে গঠিত হয় পুংগ্যামিটোফাইট যা অত্যন্ত ক্ষুদ্র। পুংগ্যামিটোফাইট স্পোরোফাইটের উপর নির্ভরশীল।

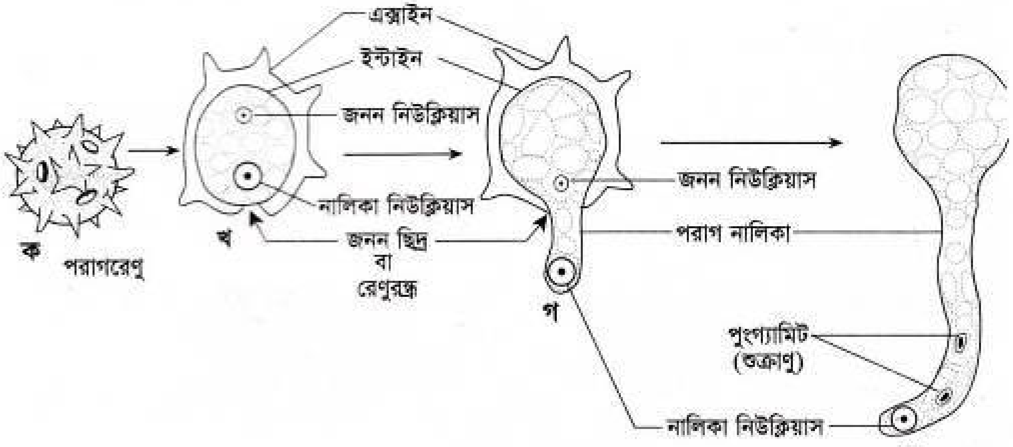
এক্সাইন
ইন্টাইন
জনন নিউক্লিয়াস
নালিকা নিউক্লিয়াস
জনন ছিদ্র বা রেণুরন্ধ্র
ক
পরাগরেণু
খ
গ
জনন নিউক্লিয়াস
পরাগ নালিকা
পুংগ্যামিট (শুক্রাণু)
নালিকা নিউক্লিয়াস
ঘ

(ক) পরাগরেণু, (খ–গ) পুংগ্যামিটোফাইট সৃষ্টির বিভিন্ন ধাপ এবং ঘ পুংগ্যামিটোফাইট।

চিত্র ১২.১.২ : পুং জনন কোষ সৃষ্টির বিভিন্ন ধাপ

ডিম্বকের পরিস্ফুটন : সপুষ্পক উদ্ভিদের স্ত্রী জননাঙ্গ বলতে স্ত্রীস্তবকের প্রত্যেকটা স্ত্রীকেশর (Carpel) কে বুঝায়। প্রতিটি স্ত্রীকেশর তিনটি অংশে বিভক্ত। যথা- গর্ভমুন্ড, গর্ভদন্ড ও গর্ভাশয় বা ডিম্বাশয়।

ডিম্বাশয়ের অভ্যন্তরে অবস্থিত স্ফিত অংশকে ডিম্বক (Ovule) বলে। ডিম্বক সৃষ্টি হয় গর্ভাশয়ের ভেতরের অমরা (Placenta) হতে। প্রথমে অমরাতে একটি ছোট স্ফিত অঞ্চলের সৃষ্টি হয়, পরে সেটা বড় হয়ে ডিম্বকে পরিণত হয়। ক্ষেত্র বিশেষে একটি ডিম্বাশয়ে এক বা একাধিক ডিম্বক থাকতে পারে। প্রাথমিকভাবে ডিম্বকের টিস্যুকে মূলত দুটি অঞ্চলে ভাগ করা চলে। যথা- চারপাশের আবরণী টিস্যু ও মাঝের নিউসেলাস (Nucellus) টিস্যু। পরে বাইরের আবরণটির নিচে অন্য একটি আবরণের সৃষ্টি হয়। বাইরের আবরণকে বহিঃত্বক এবং ভেতরের আবরণকে অন্তঃত্বক বলে। ডিম্বকের অগ্রভাগে একটি অংশে ত্বক না থাকায় নিউসেলাস উন্মুক্ত থাকে। এটিতে একটি ছিদ্র পথ থাকে, যাকে ডিম্বকরন্ধ্র বা মাইক্রোপাইল (Micropyle) বলা হয়।

ডিম্বক সৃষ্টির শুরু সবক্ষেত্রে একইভাবে হলেও পরে ডিম্বকের বৃদ্ধি একইভাবে হয় না। এ ব্যতিক্রমের জন্য পূর্ণ গঠিত ডিম্বক নানা আকৃতির হয়।

ডিম্বকের গঠন : একটি ডিম্বক (Megasporangium = ovule) নিম্নলিখিত অংশগুলো নিয়ে গঠিত-

১। **ডিম্বকনাড়ী (Funiculus) :** ডিম্বকের বোঁটার ন্যায় অংশকে ডিম্বকনাড়ী বলে। এ বোঁটার সাহায্যে ডিম্বক অমরার সাথে যুক্ত থাকে।

২। **ডিম্বকনাভী (Hilum) :** ডিম্বকের যে অংশের সাথে ডিম্বকনাড়ী সংযুক্ত থাকে তাকে ডিম্বকনাভী বলে।

৩। **নিউসেলাস (Nucellus):** ডিম্বকের মূল দেহকে ভ্রূণপোষক টিস্যু বা নিউসেলাস বলে। এটি প্যারেনকাইমা টিস্যু দ্বারা গঠিত এবং ডিম্বকত্বক দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে।

৪। **ডিম্বকমূল (Chalaza) :** ডিম্বকের গোড়ার দিকে যে অংশ হতে ডিম্বকত্বক উৎপন্ন হয় তাকে ডিম্বকমূল বলে।

৫। **ডিম্বকত্বক (Integument) :** নিউসেলাসের বাইরের আবরণকে ডিম্বকত্বক বলে। এটি সাধারণত দু'স্তরবিশিষ্ট হয়, তবে ক্ষেত্রবিশেষে একস্তর বিশিষ্টও হতে পারে।

৬। **ডিম্বকরন্ধ্র (Micropyle) :** ডিম্বকত্বক ডিম্বককে সম্পূর্ণ আবৃত না করায় শীর্ষদেশে একটি ছিদ্রের সৃষ্টি হয়। এ ক্ষুদ্র ছিদ্রপথকে ডিম্বকরন্ধ্র বলে।

৭। **ভ্রূণথলি (Embryosac) :** নিউসেলাসের মধ্যে অবস্থিত থলির ন্যায় অংশকে ভ্রূণথলি বলে।

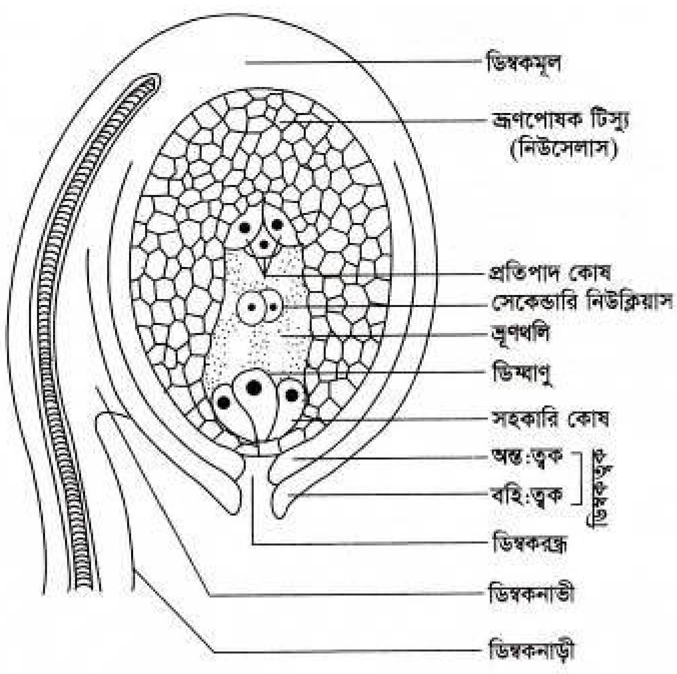

চিত্র ১২.১.৩ : একটি অধোমুখী ডিম্বকের লম্বচ্ছেদ

স্ত্রীগ্যামিটোফাইট (Female gametophyte) : স্ত্রীরেণু (Megaspore) হলো স্ত্রীগ্যামিটোফাইটের প্রথম কোষ। ডিম্বক সৃষ্টির সময় ভ্রূণপোষক টিস্যুর অধঃত্বক অঞ্চলে একটি কোষ আকারে বড় হয়। এর নিউক্লিয়াসটিও আকারে বড় এবং কোষটি ঘন সাইটোপ্লাজমে পূর্ণ থাকে। এ কোষটিকে প্রাইমারি আর্কিস্পোরিয়াল কোষ (Primary archesporial cell) বলে। আর্কিস্পোরিয়াল কোষটি বিভক্ত হয়ে একটি দেয়াল কোষ এবং একটি প্রাথমিক জনন কোষ (Primary sporoginous cell) সৃষ্টি করতে পারে অথবা সরাসরি স্ত্রীরেণু মাতৃকোষ (Megaspore mother cell) হিসেবে কাজ করতে পারে। অতঃপর স্ত্রীরেণু মাতৃকোষটি মায়োসিস প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হয়ে চারটি হ্যাপ্লয়েড স্ত্রীরেণু (Megaspore) তৈরি করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে উপরের তিনটি স্ত্রীরেণু নষ্ট হয় এবং নিচেরটি সক্রিয় থাকে। সক্রিয় স্ত্রীরেণুটি বিভাজিত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে

স্ত্রীগ্যামিটোফাইট গঠন করে। স্ত্রীগ্যামিটোফাইটকে ভ্রূণথলি বা এমব্রায়োস্যাক (Embryosac) বলা হয়। ভ্রূণথলি গঠন প্রধানত তিন প্রকার। যথা-

১। **মনোস্পোরিক (Monosporic)-** এক্ষেত্রে একটি স্ত্রীরেণু ভ্রূণথলি গঠনে অংশগ্রহণ করে।

২। **বাইস্পোরিক (Bisporic)-** এক্ষেত্রে দুটি স্ত্রীরেণু ভ্রূণথলি গঠনে অংশগ্রহণ করে।

৩। **টেট্রাস্পোরিক (Tetrasporic)-** এক্ষেত্রে চারটি স্ত্রীরেণুই ভ্রূণথলি গঠনে অংশগ্রহণ করে।

অধিকাংশ (প্রায় শতকরা ৭৫ ভাগ) উদ্ভিদে মনোস্পোরিক প্রক্রিয়ায় ভ্রূণথলি গঠিত হয়, তাই এখানে ভ্রূণথলি গঠনের মনোস্পোরিক প্রক্রিয়া বর্ণনা করা হলো। মনোস্পোরিক প্রক্রিয়াকে পলিগোনাম ধরন (Polygonum type) ও বলা হয়।

এক্ষেত্রে ডিপ্লয়েড (2n) স্ত্রীরেণু মাতৃকোষ হতে মায়োসিস প্রক্রিয়ায় চারটি হ্যাপ্লয়েড স্ত্রীরেণু গঠিত হয়, যার মধ্যে উপরের তিনটি নষ্ট হয় এবং নিচেরটি সক্রিয় থাকে। সক্রিয় স্ত্রীরেণু নিউক্লিয়াসটি মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হয়ে দুটি অপত্য নিউক্লিয়াসের সৃষ্টি করে। এদের মধ্যে একটি ডিম্বকরন্ধ্রীয় মেরুর দিকে এবং অন্যটি ডিম্বকমূলীয় মেরুর দিকে যায়।

এরপর প্রতিটি মেরুতে নিউক্লিয়াস পরপর দু'বার বিভাজিত হয়ে প্রতি মেরুতে চারটি করে মোট আটটি নিউক্লিয়াসের সৃষ্টি করে। পরে প্রতি মেরু থেকে একটি করে নিউক্লিয়াস ভ্রূণথলির মাঝখানে চলে আসে এবং পরস্পর মিলিত হয়, যাকে ফিউশন নিউক্লিয়াস বা সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াস (Fusion nucleus or secondary nucleus) বলে।

ভ্রূণথলির ডিম্বকরন্ধ্রের দিকে অবস্থিত তিনটি কোষের চারদিকে কোষ প্রাচীর গঠিত হলে, এ অঞ্চলে তিনটি কোষের সৃষ্টি হয়। এ কোষ সমষ্টিকে গর্ভযন্ত্র (Egg apparatus) বলে। তিনটি কোষের মধ্যস্থলে অবস্থিত অপেক্ষাকৃত বড় গোলাকার কোষটিকে ডিম্বাণু (Egg, ovum or monospore) বলে। ডিম্বাণুর দু'পাশের দুটি কোষকে সহকারি কোষ বা সিনারজিড (Synergid) বলা হয়। ভ্রূণথলির ডিম্বকমূলের দিকে অবস্থিত তিনটি নিউক্লিয়াস থেকেও তিনটি কোষ গঠিত হয়। এদের প্রতিপাদ কোষ (Antipodal cell) বলে।

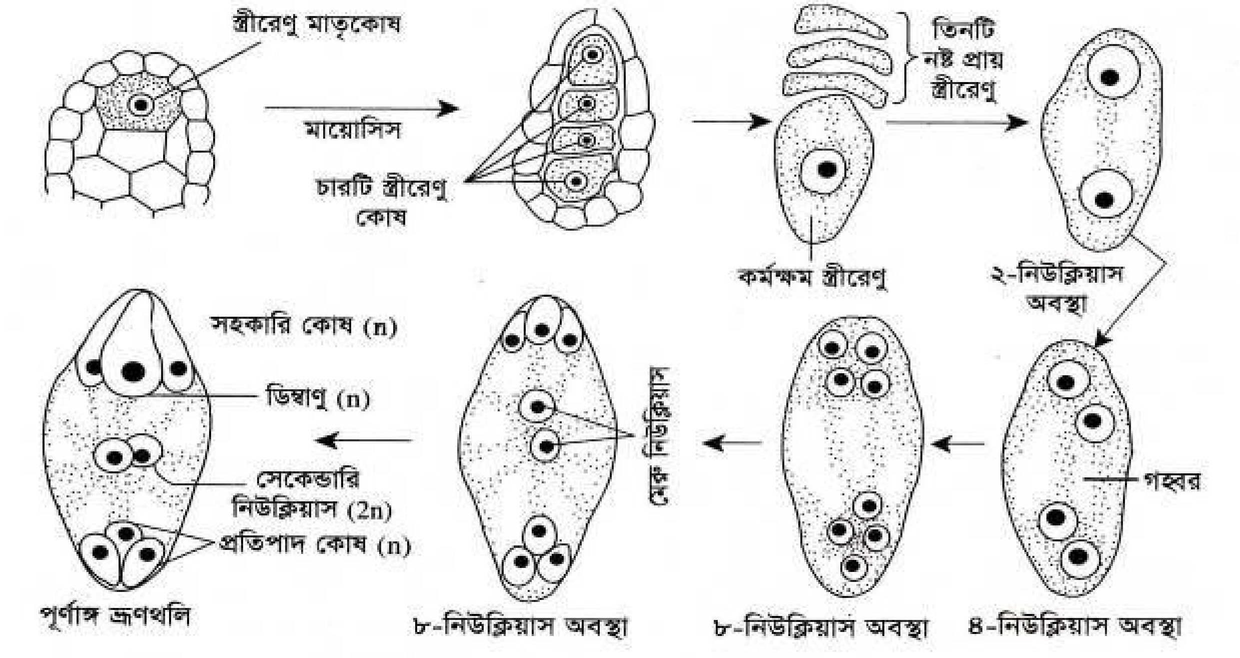
স্ত্রীরেণু মাতৃকোষ
মায়োসিস
চারটি স্ত্রীরেণু কোষ
তিনটি নষ্ট প্রায় স্ত্রীরেণু
কর্মক্ষম স্ত্রীরেণু
২-নিউক্লিয়াস অবস্থা
সহকারি কোষ (n)
ডিম্বাণু (n)
সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াস (2n)
প্রতিপাদ কোষ (n)
পূর্ণাঙ্গ ভ্রূণথলি
৮-নিউক্লিয়াস অবস্থা
মেরু নিউক্লিয়াস
৮-নিউক্লিয়াস অবস্থা
গহ্বর
৪-নিউক্লিয়াস অবস্থা

চিত্র ১২.১.৪ : স্ত্রী জনন কোষ সৃষ্টির বিভিন্ন ধাপ

ভ্রূণথলি এবং এর মধ্যে অবস্থিত ডিম্বাণু, সাহায্যকারী নিউক্লিয়াস, প্রতিপাদ নিউক্লিয়াস এবং সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াসকে মিলিতভাবে স্ত্রীগ্যামিটোফাইট বলা হয়। স্ত্রীরেণুর মধ্যেই স্ত্রীগ্যামিটোফাইট গঠিত হয়। স্ত্রীগ্যামিটোফাইটও স্পোরোফাইটের উপর নির্ভরশীল।

নিষেকক্রিয়া (Fertilization) : আকার, আকৃতি ও প্রকৃতিগত পার্থক্যমন্ডিত একটি পুংগ্যামিট ও স্ত্রীগ্যামিট এর মধ্যকার মিলন প্রক্রিয়াকে নিষেকক্রিয়া বলা হয়। একে নিষেক বা গর্ভাধানও বলে। সকল আবৃতবীজী উদ্ভিদ, ব্যক্তবীজী উদ্ভিদ, টেরিডোফাইটস্, ব্রায়োফাইটস্, শৈবাল প্রভৃতি উদ্ভিদে নিষেক ক্রিয়া ঘটে। নিষেক ক্রিয়ার ফলে ডিপ্লয়েড (2n) জাইগোট উৎপন্ন হয়।

বিজ্ঞানী স্ট্রাসবার্জার ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে সপুষ্পক উদ্ভিদে নিষেকক্রিয়া আবিষ্কার করেন। সমগ্র নিষেক প্রক্রিয়াটিকে নিম্নলিখিত ধাপে ভাগ করা যায়। যথা- (ক) পরাগরেণুর অঙ্কুরোদগম, (খ) পরাগ নালিকার গর্ভাশয়মুখী যাত্রা, (গ) পরাগ নালিকার ভ্রূণথলিতে প্রবেশ এবং (ঘ) শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মিলন।

(ক) পরাগরেণুর অঙ্কুরোদগম : পরাগরেণু গর্ভমুন্ডে পতিত হবার পর সেখান থেকে তরল পদার্থ শোষণ করে আকারে বড় হয় এবং অঙ্কুরিত হয়। অর্থাৎ পরাগরেণুর পাতলা অভ্যন্তর প্রাচীর প্রসারিত হয়ে রন্ধ্রপথে নলাকারে বের হয়ে আসে। একসঙ্গে অনেকগুলো পরাগ নালিকা উৎপন্ন হতে পারে।

(খ) পরাগ নালিকার গর্ভাশয়মুখী যাত্রা : একটি পরাগরেণুতে অনেকগুলো পরাগ নালিকা উৎপন্ন হলেও একটিমাত্র পরাগ নালিকা ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে গর্ভমুন্ড হতে গর্ভদন্ডের ভেতর দিয়ে গর্ভাশয় পর্যন্ত পৌঁছায় এবং পরে গর্ভাশয়ের স্তর অতিক্রম করে ডিম্বক পর্যন্ত পৌঁছায়। অধিকাংশ উদ্ভিদে পরাগনালিকা ডিম্বকরন্ধ্র পথে ডিম্বকে প্রবেশ করে, একে প্রোগ্যামি (Progamy) বলে। কিছু কিছু উদ্ভিদে (যেমন- ঝাউ, *Casuarina* sp.) পরাগ নালিকা ডিম্বকমূল দিয়ে ডিম্বকে প্রবেশ করে, একে ক্যালাজোগ্যামী (Chalazogamy) বলে। সাধারণত একটিমাত্র পরাগ নালিকা ডিম্বকে প্রবেশ করে। অনেক সময় পরাগ নালিকা ডিম্বকের পার্শ্বদিক দিয়ে ডিম্বকে প্রবেশ করে, একে প্লিউরোগ্যামি (Pleurogamy) বলে।

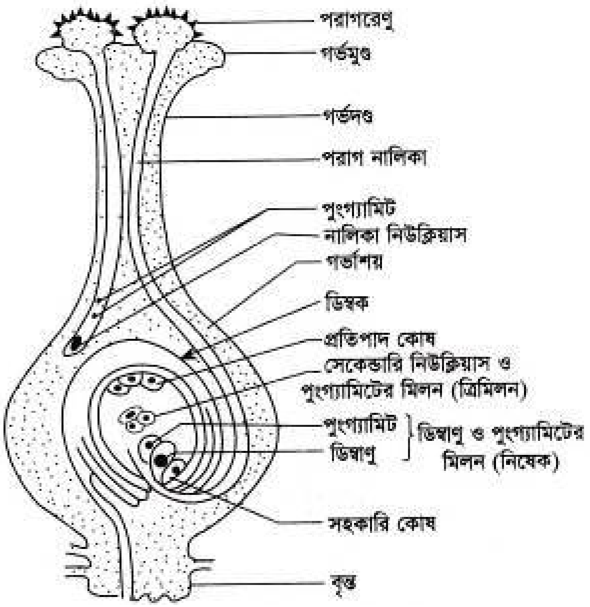

চিত্র ১২.১.৫ : গুপ্তবীজী উদ্ভিদে নিষেকক্রিয়া

(গ) পরাগ নালিকার ভ্রূণথলিতে প্রবেশ : ডিম্বকে প্রবেশের পর পরাগ নালিকা ক্রমশ ভ্রূণথলির কাছে পৌঁছে এবং শেষে ভ্রূণথলিতে প্রবেশ করে। ভ্রূণথলিতে প্রবেশের পর এটি সাহায্যকারী কোষের উপর দিয়ে ডিম্বাণুর নিকট পৌঁছে। এ সময় পরাগনালিকার অগ্রভাগ প্রসারিত হয়ে ফেঁটে যায় এবং দুটি শুক্রাণু কোষ তথা পুংগ্যামিট ভ্রূণথলিতে নিক্ষিপ্ত হয়। ভ্রূণথলিতে প্রবেশের সময় সাধারণত পরাগ নালিকার চাপে একটি সাহায্যকারী কোষ ধ্বংস হয়।

(ঘ) শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মিলন : পরাগ নালিকা হতে ভ্রূণথলিতে নিক্ষিপ্ত দুটি পুংগ্যামিটের মধ্যে একটি ডিম্বাণুর সাথে মিলিত ও একীভূত হয়, অর্থাৎ নিষেকক্রিয়া ঘটে। একে যুগ্মমিলন বা সিনগ্যামি (Syngamy) বলে। অপর পুংগ্যামিটটি সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াসের সাথে মিলিত ও একীভূত হয়, একে ত্রিমিলন বা ট্রিপল ফিউশন (Triple fusion) বলে।

দ্বিনিষেকক্রিয়া (Double fertilization) : একই সময়ে ডিম্বাণুর সাথে একটি পুংগ্যামিটের মিলন এবং সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াসের সাথে অপর পুংগ্যামিটের মিলন প্রক্রিয়াকে দ্বিনিষেকক্রিয়া (Double fertilization) বলে।

এ প্রক্রিয়ায় একটি পুংগ্যামিট ডিম্বাণুর সাথে মিলিত হয় এবং একটি পুংগ্যামিট সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াসের সাথে মিলিত হয়, ফলে ডিম্বাণু ডিপ্লয়েড (2n) জাইগোটে পরিণত হয় কিন্তু সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াস ট্রিপ্লয়েড (3n) অবস্থাপ্রাপ্ত হয়।

সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াসের সাথে একটি পুংগ্যামিটের মিলনকে ত্রিমিলন বা ট্রিপল ফিউশন (Triple fusion) বলে, কেননা এখানে দুটি মেরু নিউক্লিয়াস ও একটি পুংনিউক্লিয়াসের মিলন ঘটে।

নিষেকের পরিণতি : নিষেক ক্রিয়ার পর অর্থাৎ হ্যাপ্লয়েড (n) ডিম্বাণুর সাথে হ্যাপ্লয়েড (n) শুক্রাণুর যৌন মিলনের ফলে যে ডিপ্লয়েড (2n) কোষের উৎপত্তি হয়, তাকে জাইগোট বা উস্পোর (2n) বলে। নিষিক্ত ডিম্বাণু তথা জাইগোটই হলো স্পোরোফাইটের প্রথম কোষ। জাইগোট তার চারপাশে একটি সেলুলোজ নির্মিত প্রাচীর সৃষ্টি করে এবং কিছু সময় সুপ্ত অবস্থা অতিবাহিত করে। প্রজাতিভেদে এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর ভিত্তি করে জাইগোটের সুপ্তিকাল ভিন্নতর হয়। সুপ্ত অবস্থা কাঁটার পর জাইগোটে মাইটোটিক কোষ বিভাজন শুরু হয়। প্রথম বিভাজন আড়াআড়িভাবে ঘটে, ফলে একটি দ্বিকোষী আদিভ্রূণ (Proembryo) গঠিত হয়। আদি ভ্রূণটি পর্যায়ক্রমিক বিভাজন ও বিকাশের মাধ্যমে একটি পুর্ণাঙ্গ ভ্রূণের সৃষ্টি হয়।

অন্যদিকে সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াসের (2n, দুটি নিউক্লিয়াস) সাথে একটি শুক্রাণুর মিলনে ট্রিপ্লয়েড (3n) সস্য বা এন্ডোস্পার্ম (Endosperm) নিউক্লিয়াস গঠিত হয়। এন্ডোস্পার্ম নিউক্লিয়াস বার বার বিভাজন ঘটিয়ে ও বিকাশের মাধ্যমে সস্য টিস্যু বা এন্ডোস্পার্ম টিস্যু (Endosperm tissue) গঠন করে।

বীজ সৃষ্টি (Formation of seeds) : গুপ্তবীজী উদ্ভিদ ও ব্যক্তবীজী উদ্ভিদে বীজ সৃষ্টি হয়। নিষেকক্রিয়ার পর ডিম্বক (Ovule) বিভিন্ন ধরনের বিভাজন ও পরিবর্তনের মাধ্যমে বীজে পরিণত হয়।

জাইগোট বিভাজন ও পরিস্ফুটনের মাধ্যমে একটি ভ্রূণ গঠন করে। একটি ভ্রূণে থাকে বীজপত্র, ভ্রূণকান্ড, ভ্রূণমূল ও সস্য বা এন্ডোস্পার্ম। ভ্রূণ পরিস্ফুটনের সময় ভ্রূণপোষক টিস্যু (Nucellus) ভ্রূণকে পুষ্টি দান করে, ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভ্রূণপোষক টিস্যু নিঃশেষ হয়ে যায়। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে পরিভ্রূণ (একটি মাত্র আবরণ) হিসেবে ভ্রূণপোষক টিস্যু অবস্থান করে। আবার অনেক ক্ষেত্রে সস্য টিস্যু বা এন্ডোস্পার্মও নিঃশেষ হয়ে যায়, সে ক্ষেত্রে অসস্যল বীজের সৃষ্টি হয়।

ডিম্বকের ভেতরে এ ধরনের পরিবর্তনের সাথে সাথে ডিম্বকের ত্বকের পরিবর্তন দেখা দেয় এবং অপেক্ষাকৃত কঠিন ও শুষ্ক হয়ে বীজত্বকে পরিণত হয়। রসালো ডিম্বকটি পর্যায়ক্রমে পানি হারিয়ে শুষ্ক ও কঠিন বীজে পরিণত হয়। এ ধরনের পরিবর্তনকালে অনেক ক্ষেত্রে বীজের একটি তৃতীয় স্তর সৃষ্টি হয়, একে এরিল (Aril) বলে। এরিল লিচু ও জয়ফলে পাওয়া যায়। শাপলা বীজেও এরিল থাকে।

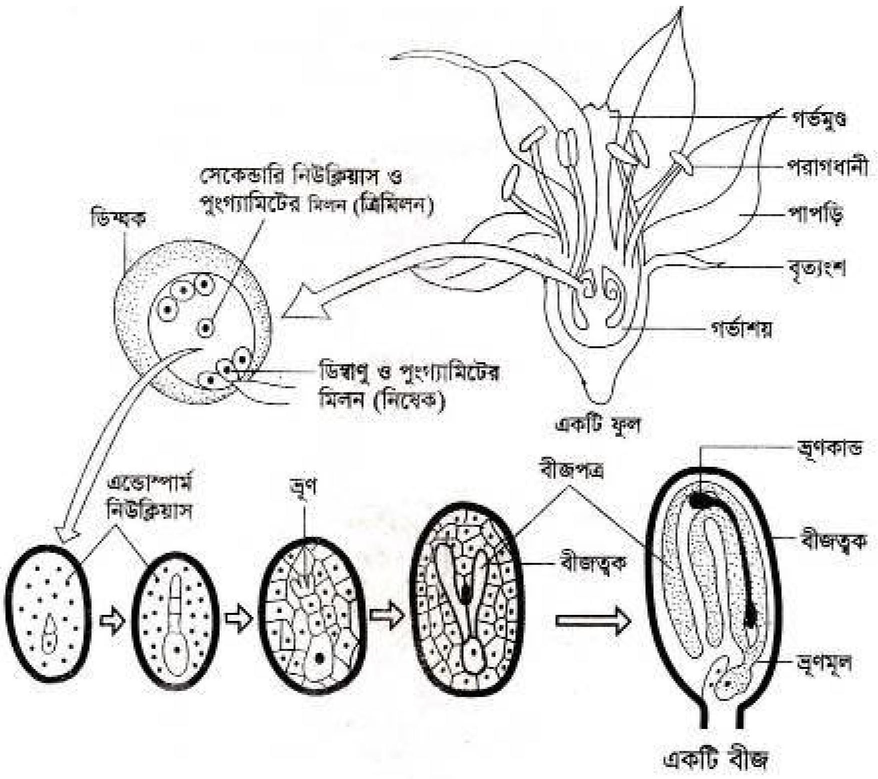
সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াস ও পুংগ্যামিটের মিলন (ত্রিমিলন)
ডিম্বক
গর্ভমুণ্ড
পরাগধানী
পাপড়ি
বৃত্যাংশ
গর্ভাশয়
ডিম্বাণু ও পুংগ্যামিটের মিলন (নিষেক)
একটি ফুল
এন্ডোস্পার্ম নিউক্লিয়াস
ভ্রূণ
বীজপত্র
বীজত্বক
ভ্রূণকান্ড
বীজত্বক
ভ্রূণমূল
একটি বীজ

চিত্র ১২.১.৬ : বীজ সৃষ্টি প্রক্রিয়া

ছক ১২.১.১ : নিষেকক্রিয়ার পর গর্ভাশয় ও ডিম্বকের বিভিন্ন পরিবর্তন

নিষেকক্রিয়ার পূর্বে	নিষেকক্রিয়ার পরে
গর্ভাশয়	ফল
গর্ভাশয় ত্বক	ফলত্বক
ডিম্বক	বীজ
এক্সাইন	টেস্টা
ইন্টাইন	টেগমেন
ভ্রূণপোষক টিস্যু	নিঃশেষ হয়ে যায়
ডিম্বাণু (নিষিক্ত)	ভ্রূণ
সস্য মাতৃকোষ	সস্য
সাহায্যকারী কোষ	নষ্ট হয়ে যায়
প্রতিপাদ কোষ	নষ্ট হয়ে যায়
মাইক্রোপাইল	মাইক্রোপাইল
হাইলাম	হাইলাম
ডিম্বকনাড়ী	বীজবৃন্ত

ক্যালাজা বা ডিম্বকমূল	নষ্ট হয়ে যায়

ছক ১২.১.২ : ডিম্বক হতে বীজে পরিবর্তন

ডিম্বক	বীজ
ডিম্বক	বীজ
ডিম্বকত্বক	বীজত্বক
ডিম্বাণু (নিষিক্ত)	ভ্রূণ
সস্য নিউক্লিয়াস	সস্য
ডিম্বকরন্ধ্র	বীজরন্ধ্র
ডিম্বকনাভী	বীজনাভী
ডিম্বকনাড়ী	বীজবৃন্ত
ভ্রূণপোষক টিস্যু	নিঃশেষ হয়ে যায়
প্রতিপাদ কোষ	নষ্ট হয়ে যায়
সাহায্যকারী কোষ	নষ্ট হয়ে যায়

নিষেকের গুরুত্ব বা তাৎপর্য : জীব জগতে নিষেকক্রিয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ জৈবিক প্রক্রিয়া। নিষেকের মাধ্যমে স্ত্রীগ্যামিটের সাথে পুংগ্যামিটের মিলন ঘটে এবং এর সাথে তাদের প্রোটোপ্লাজম ও নিউক্লিয়াসের সংযোগ ঘটে। কাজেই নিষেকক্রিয়ার ফলে গ্যামিটের হ্যাপ্লয়েড (n) অবস্থা জাইগোটের ডিপ্লয়েড (2n) অবস্থাপ্রাপ্ত হয়। নিষেকের পর ফুলের গর্ভাশয়ের ভেতরের ডিম্বকগুলো বীজে এবং গর্ভাশয় ফলে পরিণত হয়। বীজ উদ্ভিদের বংশধারা বজায় রাখে। বীজ গঠিত না হলে সপুষ্পক উদ্ভিদ পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। উদ্ভিদের ফল ও বীজের উপর নির্ভর করে মানবজাতিসহ অন্যান্য প্রাণীকূল বেঁচে আছে। কাজেই নিষেকক্রিয়া একদিকে যেমন উদ্ভিদকূলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ তেমনিভাবে মানুষসহ অন্যান্য প্রাণীকূলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

অযৌন জনন (Asexual reproduction) : দুটি গ্যামিটের মিলন ছাড়া অন্য উপায়েও জনন হতে পারে। পুংগ্যামিট ও স্ত্রী গ্যামিটের মিলন ছাড়া উদ্ভিদে যে প্রজনন ঘটে তাকে অযৌন জনন বলে। অযৌন জনন বিভিন্নভাবে হতে পারে। যথা-

১। দ্বিভাজন প্রক্রিয়া : ব্যাকটেরিয়া ও কয়েক প্রকার এককোষী শৈবালের ক্ষেত্রে মাতৃকোষটি সরাসরি বিভাজিত হয়ে দুটি অপত্য কোষের সৃষ্টি করে। প্রতিটি অপত্য কোষ বৃদ্ধি পেয়ে পুর্ণাঙ্গ কোষে পরিণত হয়।

২। কুঁড়ি বা বাড (Bud) উৎপাদনের মাধ্যমে : এককোষী ছত্রাকের মাতৃকোষ হতে এক বা একাধিক কুঁড়ি বা বাড উৎপন্ন হয়। কুঁড়িগুলো মাতৃকোষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অপত্য কোষে পরিণত হয়।

৩। খন্ডায়নের মাধ্যমে : কিছু কিছু সূত্রাকর শৈবাল স্রোত বা আঘাতজনিত কারণে অনেকগুলো খন্ডে বিভক্ত হয়। পরে প্রতিটি খন্ড বিভাজনের মাধ্যমে অপত্য উদ্ভিদদেহে পরিণত হয়। উদাহরণ- *Spirogyra, Oscillatoria* ইত্যাদি শৈবাল।

৪। অযৌন রেণু বা স্পোর সৃষ্টির মাধ্যমে : নিম্নশ্রেণির উদ্ভিদে স্পোর বা রেণুর মাধ্যমে অযৌন জনন ঘটে।

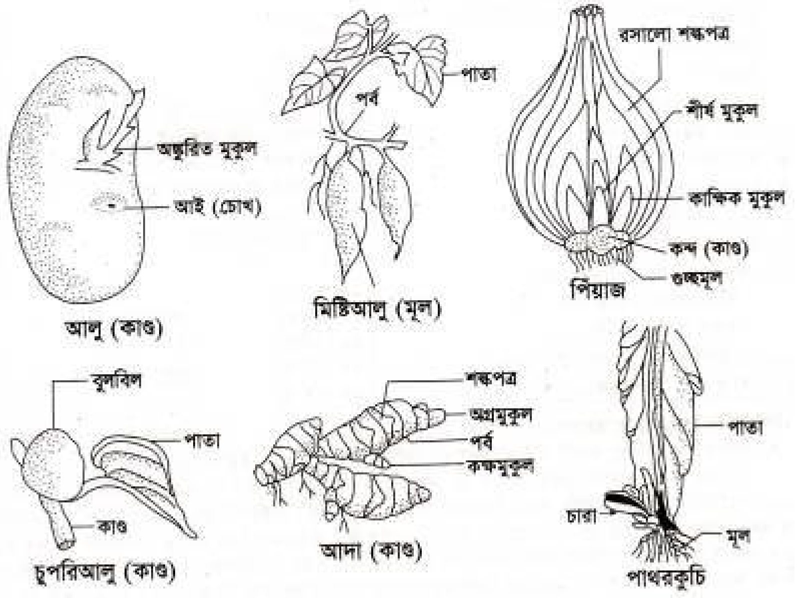
অঙ্কুরিত মুকুল
আই (চোখ)
আলু (কাণ্ড)
পাতা
পর্ব
মিষ্টিআলু (মূল)
রসালো শল্কপত্র
শীর্ষ মুকুল
কাক্ষিক মুকুল
কন্দ (কাণ্ড)
গুচ্ছমূল
পিঁয়াজ
কুলবিল
পাতা
কাণ্ড
চুপরিআলু (কাণ্ড)
শল্কপত্র
অগ্রমুকুল
পর্ব
কক্ষমুকুল
আদা (কাণ্ড)
পাতা
চারা
মূল
পাথরকুচি

(চিত্র ১২.১.৭ : কয়েকটি উদ্ভিদের স্বাভাবিক অঙ্গজ জনন)

যেমন- শৈবাল, ছত্রাক, মস, ফার্ণ ইত্যাদি। কিছু কিছু শৈবালে চলরেণু বা জুস্পোর (Zoospore) সৃষ্টির ম্যাধমে মাতৃ উদ্ভিদের অনুরূপ উদ্ভিদ সৃষ্টি হয়। যেমন- *Trentepohlia, Oedogonium, Vaucheria, Chaetophora, Ulothrix* ইত্যাদি।

৫। **দেহ অঙ্গের মাধ্যমে :** দেহ অঙ্গের মাধ্যমেও অযৌন জনন ঘটে। এ ধরনের অযৌন জননকে অঙ্গজ জননও (Vegetative reproduction) বলা হয়। এটা আবার দু'ভাবে হয়। যথা- (ক) স্বাভাবিক অঙ্গজ জনন এবং (খ) কৃত্রিম উপায়ে অঙ্গজ জনন।

(ক) স্বাভাবিক অঙ্গজ জনন : কিছু কিছু উদ্ভিদের মূল থেকে নতুন উদ্ভিদের সৃষ্টি হয়। যেমন- মিষ্টি আলু, ডালিয়া, কাঁকরোল, পটল ইত্যাদি। কতিপয় উদ্ভিদের কান্ড থেকে নতুন উদ্ভিদের সৃষ্টি হয়। যেমন- আদা, হলুদ, সটি, আলু, ওলকচু ইত্যাদি। কিছু উদ্ভিদের পাতার কিনারায় পত্রাশ্রয়ী মুকুল হতে নতুন উদ্ভিদের সৃষ্টি হয়। যথা- পাঁথরকুচি।

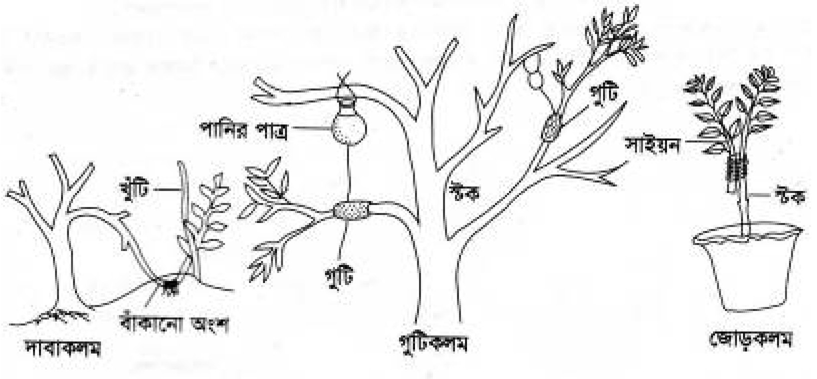

চিত্র ১২.১.৮ : কৃত্রিম অঙ্গজ প্রজনন (কলম করার বিভিন্ন পদ্ধতি)

(খ) কৃত্রিম অঙ্গজ জনন : এটি বিভিন্ন উপায়ে হতে পারে। যথা-

১। শাখা কলম দ্বারা- কতিপয় উদ্ভিদের কান্ড থেকে স্বাভাবিকভাবে নতুন উদ্ভিদ জন্মায় না কিন্তু উদ্ভিদের শাখা কেঁটে ভেজা মাটিতে রোপন করলে নতুন উদ্ভিদের সৃষ্টি হয়। যেমন- গোলাপ, চাঁপা, জবা ইত্যাদি।

২। গুটি কলমের মাধ্যমে- অনেক উদ্ভিদের শাখার চারপাশের বাকল ছাড়িয়ে নিয়ে তার চারদিকে সার ও গোবর মাটির প্রলেপ দিয়ে তার উপরে খড় বা চটের বস্তা বেঁধে রাখলে, উক্ত স্থানে শিকড় গজায় তখন শিকড়সহ শাখাটি মাতৃ উদ্ভিদ থেকে আলাদা করে অন্যত্র রোপন করা হয়। যেমন- গোলাপ, আম, লেবু, লিচু ইত্যাদি।

৩। দাবা কলমের দ্বারা- এক্ষেত্রে গাছের একটি শাখাকে মাটির সাথে আবদ্ধ করে প্রত্যেক দিন উক্ত স্থানে পানি দেয়া হয়। কয়েক দিনের মধ্যে মাটিতে আবদ্ধ শাখার পর্ব থেকে মূল গজায়। পরে মূলসহ শাখাটিকে কেটে অন্যত্র রোপন করা হয়। যেমন- চন্দ্রমল্লিকা, পুদিনা, লেবু ইত্যাদি।

অপুংজনি (Parthenogenesis)- সাধারণত দুটি বিপরীতধর্মী গ্যামিটের (পুংগ্যামিট ও স্ত্রীগ্যামিট) যৌন মিলনের মাধ্যমে যৌন জনন ঘটে। কোন কোন উদ্ভিদে অনেক সময় যৌন মিলন না ঘটলেও একটি গ্যামিট নতুন উদ্ভিদের সৃষ্টি করে। যেমন- *Spirogyra*। নিষেক ছাড়া একটি গ্যামিট হতে ভ্রূণ সৃষ্টি তথা নতুন উদ্ভিদ সৃষ্টি প্রক্রিয়াকে অপুংজনি বা পার্থেনোজেনেসিস বলে। পার্থেনোজেনেসিস দু'ধরনের হতে পারে। যথা– হ্যাপ্লয়েড এবং ডিপ্লয়েড ।

হ্যাপ্লয়েড অপুংজনি- হ্যাপ্লয়েড (n) অনিষিক্ত ডিম্বাণু বা শুক্রাণু হতে ভ্রূণ সৃষ্টি হলে তাকে হ্যাপ্লয়েড **অপুংজনি** বলে। যেমন- হ্যাপ্লয়েড শুক্রাণু হতে ভ্রূণ সৃষ্টি হয়। উদাহরণ- তামাক (*Nicotiana* sp.)। অনিষিক্ত ডিম্বাণু হতে ভ্রূণ সৃষ্টি হয়। উদাহরণ- *Solanum nigrum, Orchis maculata*।

ডিপ্লয়েড অপুংজনি - ডিপ্লয়েড (2n) ভ্রূণপোষক কলা (Nucellus) হতে সরাসরি ভ্রূণ সৃষ্টি হতে পারে অথবা ডিপ্লয়েড গ্যামিটোফাইট সৃষ্টির মাধ্যমেও (ত্রুটিপূর্ণ মায়োসিসের জন্য ডিপ্লয়েড অবস্থা থেকে যায়) ভ্রূণ সৃষ্টি হতে পারে। যথা- *Parthenium argentatum, Taraxacum albidum* ইত্যাদি।

অসংজনি (Apogamy) : ডিম্বাণু ছাড়া ভ্রূণথলির অন্য কোন কোষ (মায়োসিস না হওয়ায় ডিপ্লয়েড থাকে) থেকে ভ্রূণ সৃষ্টির মাধ্যমে সক্রিয় বীজ সৃষ্টি হলে তাকে অসংজনি বা অ্যাপোগ্যামি বলে। যেমন- শতকরা ১০ ভাগ ফার্ণ উদ্ভিদে অ্যাপোগ্যামি হয়। এক্ষেত্রে ডিপ্লয়েড গ্যামিটোফাইট তৈরি এবং তা থেকে সরাসরি স্পোরোফাইটিক উদ্ভিদ সৃষ্টি হয়।

অরেণুজনি (Apospory) : কোন দেহ কোষ (Somatic cell) হতে সরাসরি গ্যামিটোফাইটের সৃষ্টি হলে তাকে অরেণুজনি বা অ্যাপোস্পোরি বলে। গর্ভাশয়ের (Ovule) যে কোনো কোষ হতে ডিপ্লয়েড গ্যামিটোফাইট তৈরি হয়ে সেখান থেকে সরাসরি কার্যক্ষম ভ্রূণসহ বীজ সৃষ্টি হয়। যেমন- টেরিস (Pteris)।

অ্যাগামোস্পার্মি (Agamospermy) : নিষেক ছাড়া কার্যক্ষম বীজ উৎপাদন প্রক্রিয়াকে অ্যাগামোস্পার্মি বলে। ইহা এক ধরনের অযৌন জনন প্রক্রিয়া। অ্যাগামোস্পার্মি প্রক্রিয়া সমাপ্ত করতে পরাগায়ন প্রয়োজন হলে তাকে সিউডোগ্যামি (Pseudogamy) বলে। এক্ষেত্রে সস্য সৃষ্টির জন্য পরাগায়ন প্রয়োজন হয়। পার্থেনোজেনেসিস, অ্যাপোস্পোরি, অ্যাপোগ্যামি সবই অ্যাগামোস্পার্মির আওতাধীন। যেমন- *Rubus fruticosus, Rananculus auricomus* প্রভৃতি উদ্ভিদে সিউডোগ্যামি ঘটে।

জনুক্রম (Alternation of generation) : কোন জীবের জীবন চক্রে হ্যাপ্লয়েড বা যৌন জনু (গ্যামিটোফাইটিক পর্যায়, n) এবং ডিপ্লয়েড বা অযৌন জনু (স্পোরোফাইটিক পর্যায়, 2n) পর্যায়ক্রমে আবির্ভূত হলে, তাকে জনুক্রম বলা হয়। এখানে হ্যাপ্লয়েড এবং ডিপ্লয়েড উদ্ভিদ স্বাধীন অর্থাৎ একের পর অন্য পর্যায় নির্ভরশীল হলেও তারা প্রজনন ছাড়াও স্বাধীনভাবে চলতে পারে। এখানে গুপ্তবীজী উদ্ভিদের (Angiosperm) জনুক্রম রেখাচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো-

এক্ষেত্রে (আবৃতবীজী উদ্ভিদে) গ্যামিটোফাইটিক পর্যায় অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত এবং স্পোরোফাইটিক পর্যায় দীর্ঘ। গ্যামিটোফাইট অত্যন্ত ক্ষুদ্র এবং কোন আলাদা উদ্ভিদ নয় বরং স্পোরোফাইটের উপর নির্ভরশীল।

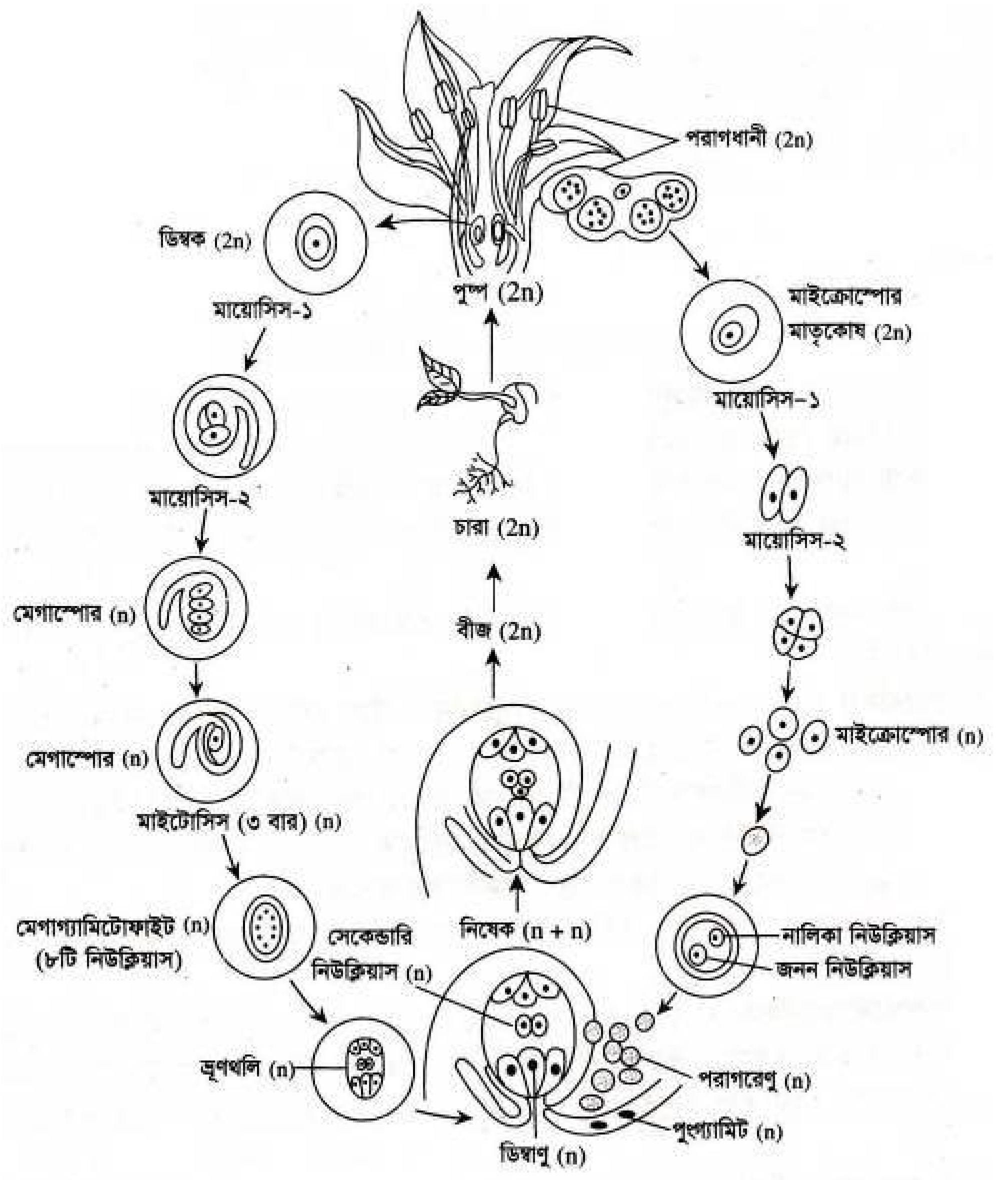
পরাগধানী (2n)
ডিম্বক (2n)
পুষ্প (2n)
মাইক্রোস্পোর মাতৃকোষ (2n)
মায়োসিস-১
মায়োসিস-১
মায়োসিস-২
চারা (2n)
মায়োসিস-২
মেগাস্পোর (n)
বীজ (2n)
মেগাস্পোর (n)
মাইক্রোস্পোর (n)
মাইটোসিস (৩ বার) (n)
মেগাগ্যামিটোফাইট (n)
(৮টি নিউক্লিয়াস)
সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াস (n)
নিষেক (n + n)
নালিকা নিউক্লিয়াস
জনন নিউক্লিয়াস
ভ্রূণথলি (n)
পরাগরেণু (n)
পুংগ্যামিট (n)
ডিম্বাণু (n)

চিত্র ১২.১.৯ : আবৃতবীজী উদ্ভিদের জীবনচক্রে জনুক্রম

শিক্ষার্থীর কাজ	নিচের ছকে পার্থেনোজেনেসিস ঘটে এমন তিনটি উদাহরণ লিখুন	

সারসংক্ষেপ

মাতৃ জীব থেকে নতুন জীব সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে প্রজনন বলা হয়। প্রতিটি জীবেরই তার নিজের অনুরূপ বংশধর সৃষ্টির প্রাকৃতিক অবস্থা রয়েছে। উদ্ভিদ বিভিন্ন উপায়ে প্রজনন সম্পন্ন করে থাকে। তবে উদ্ভিদে প্রজনন প্রধানত দু'প্রকার। যথা- যৌন প্রজনন এবং অযৌন প্রজনন। দুটি ভিন্ন প্রকৃতির যথা- পুং ও স্ত্রীগ্যামিট পরস্পরের সাথে মিলিত হয়ে যে প্রজনন সম্পন্ন করে তাকে যৌন প্রজনন বলা হয়। আকার, আকৃতি ও প্রকৃতিগত পার্থক্যমন্ডিত একটি পুংগ্যামিট ও স্ত্রীগ্যামিট এর মধ্যকার মিলন প্রক্রিয়াকে নিষেকক্রিয়া (Fertilization) বলা হয়। একে নিষেক বা গর্ভাধানও বলে। বিজ্ঞানী স্ট্রাসবার্জার ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে সপুষ্পক উদ্ভিদে নিষেকক্রিয়া আবিষ্কার করেন। সমগ্র নিষেকক্রিয়াকে নিম্নলিখিত

ধাপে ভাগ করা যায়। যথা- পরাগরেণুর অঙ্কুরোদগম, পরাগনালিকার গর্ভাশয়মুখী যাত্রা, পরাগনালিকার ভ্রূণথলিতে প্রবেশ এবং শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মিলন। দুটি গ্যামিটের মিলন ছাড়া অন্য উপায়েও জনন হতে পারে। পুংগ্যামিট ও স্ত্রীগ্যামিটের মিলন ছাড়া উদ্ভিদে যে প্রজনন ঘটে একে অযৌন জনন বলে। অযৌন জনন বিভিন্নভাবে হতে পারে। যথা- ১। দ্বিভাজন প্রক্রিয়া, ২। কুঁড়ি বা বাড (Bud) উৎপাদনের মাধ্যমে, ৩। খন্ডায়নের মাধ্যমে, ৪। অযৌন রেণু বা স্পোর সৃষ্টির মাধ্যমে এবং ৫। দেহ অঙ্গের মাধ্যমে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১২.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। উদ্ভিদের প্রজনন কত ধরনের হয় ?

(ক) ২ (খ) ৩ (গ) ৪ (ঘ) ৫

২। যৌন জনন-

i. জীবের বংশবিস্তারে সহায়তা করে
ii. জীবের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অপরিবর্তিত রাখে
iii. জীবের অভিব্যক্তিতে ভূমিকা রাখে

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii, ও iii

৩। মূলের সাহায্যে জনন হয়-

i. পটল
ii. মূলা
iii. কাঁকরোল

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii, ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দিন-

রিতা রাস্তা দিয়ে যাবার সময় রাস্তার পাশে একটি বাগানে লেবু গাছ, কুল গাছ এবং গোলাপের চারা দেখলেন।

৪। রিতার দেখা তৃতীয় গাছটি থেকে নতুন গাছ তৈরির সহজ পদ্ধতি নিচের কোনটি ?

(ক) শাখা কলম (খ) চোখ কলম (গ) দাবা কলম (ঘ) গুটি কলম

৫। রিতার দেখা তৃতীয় গাছটির সংখ্যাবৃদ্ধির জন্য-

i. শাখা কলম করতে হবে
ii. উদ্ভিদ কান্ডের ৪-৫ পর্ববিশিষ্ট শাখা কাটতে হবে
iii. হরমোন দ্রবণে ডুবাতে হবে

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii, ও iii

পাঠ-১২.২ বিভিন্ন প্রকার প্রজনন প্রক্রিয়ার মধ্যে তুলনা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- যৌন এবং অযৌন প্রজনন প্রক্রিয়ার মধ্যে তুলনা উল্লেখ করতে পারবেন।

যৌন এবং অযৌন প্রজনন প্রক্রিয়ার মধ্যে তুলনা একটি মাধ্যমে দেখানো হলো-

তুলনার বিষয়	যৌন প্রজনন	অযৌন প্রজনন

কোন শ্রেণীর জীবে ঘটে	উচ্চশ্রেণির জীবে ঘটে	নিম্নশ্রেণির জীবে ঘটে
গ্যামিট	পুং ও স্ত্রী গ্যামিট উৎপন্ন হয়	কোন প্রকার গ্যামিট উৎপন্ন হয় না
উৎপন্ন জীবের বৈচিত্র্যতা	জীবের বৈচিত্র্যতা দেখা যায়	জীবের বৈচিত্র্যতা দেখা যায় না
উৎপন্ন জীবের সংখ্যা	স্বল্প	অনেক
সহনশীলতা	অপত্য জীব বেশি সহনশীলসম্পন্ন হয়	উৎপন্ন জীব কম সহনশীলসম্পন্ন হয়
যেভাবে সম্পন্ন হয়	পুং ও স্ত্রী গ্যামিটের মিলনের মাধ্যমে ঘটে	কোষ বিভাজনের মাধ্যমে ঘটে
নিষেক	নিষেকের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়	নিষেক ছাড়াই সম্পন্ন হয়
কোষের অংশ গ্রহণ	এক্ষেত্রে উদ্ভিদের দু'ধরনের জনন কোষই অংশ নেয়	এক্ষেত্রে উদ্ভিদ দেহের অংশবিশেষ অংশ গ্রহণ করে

শিক্ষার্থীর কাজ	নিচের ছকে জীবের যৌন ও অযৌন প্রজনন প্রক্রিয়ার মধ্যে তিনটি পার্থক্য লিখুন		
যৌন প্রজনন			
অযৌন প্রজনন			

সারসংক্ষেপ

উদ্ভিদের যৌন ও অযৌন জননের পার্থক্যের বিষয়গুলো হলো- কোন শ্রেণীর জীবে ঘটে, গ্যামিট, উৎপন্ন জীবের বৈচিত্র্যতা, উৎপন্ন জীবের সংখ্যা, সহনশীলতা, যেভাবে সম্পন্ন হয়, নিষেক এবং কোষের অংশ গ্রহণ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১২.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। নিষেক ক্রিয়ার মাধ্যমে সংঘটিত প্রজননকে বলে ?

(ক) যৌন (খ) অযৌন (গ) পার্থেনোজেনেসিস (ঘ) অ্যাপোগ্যামি

২। উদ্ভিদের যৌন ও অযৌন জননের পার্থক্যের বিষয়গুলো হলো-

i. কোন শ্রেণির জীবে ঘটে ii. সহনশীলতা iii. নিষেক

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii, ও iii

পাঠ-১২.৩ কৃত্রিম প্রজননের ধারণা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- কৃত্রিম প্রজনন সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- কৃত্রিম প্রজননের পদ্ধতিগুলো উল্লেখ করতে পারবেন।

প্রধান শব্দ	সংকর, সংকরায়ন, ভ্যারাইটি

কৃত্রিম প্রজনন : এমন এক সময় ছিল যখন প্রাকৃতিক উপায়ে উদ্ভিদ থেকে আমরা যা পেতাম তাতেই আমাদের প্রয়োজন মিটতো। সে অবস্থা আর নেই। মানুষ এখন চেষ্টা করছে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার জ্ঞান কাজে লাগিয়ে উদ্ভিদের উন্নতি করতে যাতে উৎপাদনের সময় কম হয়, উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, ক্ষরা, শৈত্য, বন্যা, লবণাক্ততা, রোগব্যাধি, কীটপতঙ্গ প্রতিরোধ করতে পারে। উদ্যান উদ্ভিদের ফুলের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পায় ইত্যাদি। বর্তমানে প্রচলিত ফসল থেকে আরও উন্নত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন নতুন প্রকরণ উদ্ভাবন প্রক্রিয়াকে সাধারণভাবে ব্রিডিং বলা হয়। দুটি বৈসাদৃশ্যসম্পন্ন নির্বাচিত উদ্ভিদের মধ্যে যেখানে প্রাকৃতিক উপায়ে পরাগায়ন ও প্রজনন ঘটানো সম্ভব সেখানে নিয়ন্ত্রিত উপায়ে পরাগায়ন ঘটিয়ে উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন সাধন করে উন্নত জাত বা প্রকরণ সৃষ্টি করাকে উদ্ভিদের কৃত্রিম প্রজনন বলে। এ প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট উদ্ভিদকে সংকর (Hybrid) উদ্ভিদ বলে। উন্নত নতুন ফসল সৃষ্টি প্রক্রিয়াগুলোর মধ্যে সংকরায়ন অন্যতম। প্রকৃতিতে প্রাকৃতিকভাবেও কিছু কিছু সংকরায়ন ঘটে। তবে সাধারণত কৃত্রিমভাবে সংকরায়ন ঘটানো হয়। সংকরায়ন হলো উদ্ভিদ সুপ্রজননের এমন একটি পদ্ধতি যেখানে এক বা একাধিক জিনগত বৈশিষ্ট্যে ভিন্ন দু’ বা ততোধিক উদ্ভিদের মধ্যে ক্রস করিয়ে নতুন ভ্যারাইটি (জাত) উদ্ভাবন করা হয়।

কৃত্রিম প্রজননের পদ্ধতি : উদ্ভিদবিজ্ঞানের অন্যতম শাখার নাম উদ্ভিদ প্রজননবিদ্যা। যে সকল পদ্ধতির মাধ্যমে উদ্ভিদের নতুন প্রকরণ উদ্ভাবন করা হয় সেগুলো হলো- উদ্ভিদ প্রবর্তন, নির্বাচন, সংরক্ষণ, মিউটেশন, পলিপ্লয়ডি এবং সংকরায়ন।

শিক্ষার্থীর কাজ		নিচের ছকে কৃত্রিম প্রজননের পদ্ধতিগুলোর নাম লিখুন			

সারসংক্ষেপ

দুটি বৈসাদৃশ্যসম্পন্ন নির্বাচিত উদ্ভিদের মধ্যে যেখানে প্রাকৃতিক উপায়ে পরাগায়ন ও প্রজনন ঘটানো সম্ভব সেখানে নিয়ন্ত্রিত উপায়ে পরাগায়ন ঘটিয়ে উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন সাধন করে উন্নত জাত বা প্রকরণ সৃষ্টি করাকে উদ্ভিদের কৃত্রিম প্রজনন বলে। এ প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট উদ্ভিদকে সংকর (Hybrid) উদ্ভিদ বলে। যে সকল পদ্ধতির মাধ্যমে উদ্ভিদের নতুন প্রকরণ উদ্ভাবন করা হয় সেগুলো হলো- উদ্ভিদ প্রবর্তন, নির্বাচন, সংরক্ষণ, মিউটেশন, পলিপ্লয়ডি এবং সংকরায়ন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১২.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। কৃত্রিম প্রজনন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট উদ্ভিদকে কি বলে ?

(ক) সংকর (খ) মিউটেন্ট (গ) উন্নত জাত (ঘ) অনুন্নত জাত

২। কৃত্রিম প্রজননের পদ্ধতিগুলো হলো-

i. উদ্ভিদ প্রবর্তন ii. সংকরায়ন iii. মিউটেশন

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii, ও iii

পাঠ-১২.৪ উদ্ভিদের সংকরায়ন

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- কৃত্রিম সংকরায়ন সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- কৃত্রিম সংকরায়ন সৃষ্টির ধাপগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।

	প্রধান শব্দ	প্রজনক, ইমাসকুলেশন, ব্যাগিং, ক্রসিং

কৃত্রিম সংকরায়ন : দুটি ভিন্ন জিনোটাইপ বিশিষ্ট উদ্ভিদের মধ্যে কৃত্রিম উপায়ে প্রজনন ঘটিয়ে নুতন প্রকরণ সৃষ্টি করার প্রক্রিয়াকে কৃত্রিম প্রজনন বা কৃত্রিম সংকরায়ন বলে। কৃত্রিম সংকরায়নের ধাপগুলো নিচে উল্লেখ করা হলো-

(ক) প্রজনক (Parent) নির্বাচন : এ পর্যায়ে কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী সুস্থ, সবল ও রোগমুক্ত উদ্ভিদগুলোকে পিতা-মাতা হিসেবে নির্বাচন করা হয়।

(খ) প্রজনকের কৃত্রিম স্বপরাগায়ন : হোমোজাইগাস (Homogygous) করার জন্য পর পরাগী উদ্ভিদগুলোকে কৃত্রিম উপায়ে স্বপরাগায়ন করা হয়।

(গ) ইমাসকুলেশন : উভলিঙ্গ ফুলেই ইমাসকুলেশন করতে হয়। এর উদ্দেশ্য স্বপরাগায়ন রোধ করা। একলিঙ্গ ফুল কিংবা পরপরাগী ফুলের ইমাসকুলেশনের প্রয়োজন হয় না। এ প্রক্রিয়াতে মাতা উদ্ভিদের ফুল থেকে পুংকেশরগুলোকে পরাগধানী পরিপক্ক হবার আগেই চিমটা বা ছোট কাঁচির সাহায্যে সরিয়ে ফেলতে হয়। এর ফলে উভয়লিঙ্গ ফুলটি স্ত্রী ফুলে পরিণত হয়।

(ঘ) ব্যাগিং : পলিথিন ব্যাগের সাহায্যে প্রজননে ব্যবহৃত ইমাসকুলেশনকৃত স্ত্রী মাতা উদ্ভিদের ফুলকে ঢেকে রাখতে হয় যাতে অন্য ফুলের পরাগরেণু মাতা ফুলে আসতে না পারে।

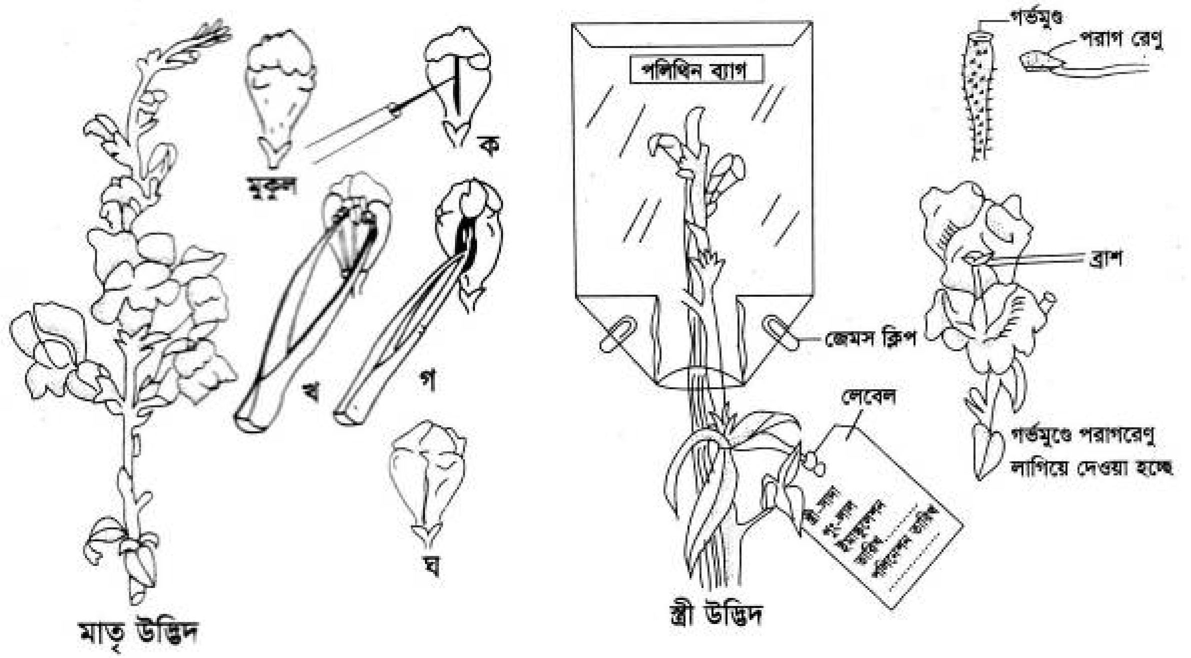

চিত্র ১২.৪ : ক্রসিং এর বিভিন্ন পর্যায় (ক-ঘ) ইমাসকুলেশন

(ঙ) ক্রসিং বা কৃত্রিম পরাগায়ন : এ প্রক্রিয়াতে পিতা উদ্ভিদের ফুলের পরিপক্ক পরাগধানী থেকে পরাগ রেণুগুলোকে সূক্ষ্ম তুলির সাহায্যে মাতা উদ্ভিদের (ইমাসকুলেশনকৃত স্ত্রী) ফুলের গর্ভমুন্ডের উপর স্থাপন করা হয়। পরাগায়নের পর মাতা উদ্ভিদকে আবার ব্যাগিং করা হয়।

(চ) লেবেলিং : পরাগায়নের পর একটি ছোট কার্ডে ফিল্ড রেকর্ড নম্বর, ইমাসকুলেশনের তারিখ, ক্রসিং এর তারিখ, মাতা ও পিতা উদ্ভিদের পরিচিতি লিখে মাতা উদ্ভিদের গায়ে ঝুলিয়ে দেয়া হয়।

(ছ) বীজ সংগ্রহ : ফল পেকে গেলে বীজ সংগ্রহ করে শুকিয়ে লেবেলিং করে ব্যাগে ভরে রাখা হয়।

(জ) বীজ বপন ও F_1 উদ্ভিদের উদ্ভব : পরবর্তী বছর কৃত্রিম ক্রসের ফলে সৃষ্ট বীজগুলো বপন করা হয় এবং F_1 বংশধর সৃষ্টি হয়। **F_1** বংশধরগুলো হলো নির্বাচিত প্রজনকের **(Parent)** হাইব্রিড। পরে F_2, F_3, ..., F_6 পর্যন্ত বংশধর সৃষ্টি করে উন্নত বৈশিষ্ট্যমন্ডিত নতুন প্রকরণ সৃষ্টি করা হয়।

(ঝ) F_1 বংশধরের ব্যবহার এবং নতুন প্রকরণ সৃষ্টি : F_1 বংশধরের দুটি উদ্ভিদের মধ্যে ক্রস করিয়ে যে সকল উদ্ভিদের সৃষ্টি হয় সেগুলো হলো F_2 বংশধর। একই পদ্ধতিতে কয়েক প্রজন্ম ধরে এভাবে সংকরায়ন করতে করতে একটি নতুন প্রকরণের জন্ম হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	নিচের ছকে কৃত্রিম প্রজননের ধাপগুলো লিখুন			

সারসংক্ষেপ

দুটি ভিন্ন জিনোটাইপবিশিষ্ট উদ্ভিদের মধ্যে কৃত্রিম উপায়ে প্রজনন ঘটিয়ে নুতন প্রকরণ সৃষ্টি করার প্রক্রিয়াকে কৃত্রিম প্রজনন বা কৃত্রিম সংকরায়ন বলে। কৃত্রিম সংকরায়নের ধাপগুলো হলো- (ক) প্যারেন্ট নির্বাচন, (খ) প্যারেন্টের কৃত্রিম স্বপরাগায়ন, (গ) ইমাসকুলেশন, (ঘ) ব্যাগিং, (ঙ) ক্রসিং বা কৃত্রিম পরাগায়ন, (চ) লেবেলিং, (ছ) বীজ সংগ্রহ, (জ) বীজ বপন ও F_1 উদ্ভিদের উদ্ভব, (ঝ) F_1 বংশধরের ব্যবহার এবং নতুন প্রকরণ সৃষ্টি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১২.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। কৃত্রিম প্রজননে ব্যবহৃত উদ্ভিদের জিনোটাইপ কী ধরনের ?

(ক) বহু বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন　　(খ) দুটি বৈশিষ্ট্যে মিলসম্পন্ন

(গ) ভিন্ন বৈশিষ্ট্যসম্পন　　(ঘ) একই বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন

২। কৃত্রিম সংকরায়নের ধাপগুলো হলো-

i. প্যারেন্ট নির্বাচন　　ii. ইমাসকুলেশন　　iii. লেবেলিং

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i ও ii　　(খ) ii ও iii　　(গ) i ও iii　　(ঘ) i, ii, ও iii

পাঠ-১২.৫ কৃত্রিম প্রজননের গুরুত্ব

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- কৃত্রিম প্রজননের অর্থনৈতিক গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

প্রধান শব্দ	BRRI, IRRI

কৃত্রিম প্রজননের অর্থনৈতিক গুরুত্ব : কৃত্রিম প্রজননের অর্থনৈতিক গুরুত্ব অপরিসীম। এর মাধ্যমে সৃষ্টি করা হয়েছে অসংখ্য উন্নত ফলনশীল ফসল। উন্নত ফলনশীল প্রকরণগুলোর অধিকাংশই রোগ ও খরা প্রতিরোধক্ষম। প্রতি বছর পৃথিবীতে উন্নত ফলনশীল প্রকরণগুলোর কারণে লক্ষ লক্ষ টন ফলন বেড়ে যায়। নিম্নে কৃত্রিম প্রজননের গুরুত্ব সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো-

১। কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে উচ্চ ফলনশীল উদ্ভিদ (ধান, পাট, গম, আখ প্রভৃতি) সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে। বাংলাদেশে ধান গবেষণা কেন্দ্রে (BRRI) উদ্ভাবিত হয়েছে উচ্চ ফলনশীল ধান। যেমন- মুক্তা (BR$_{11}$), রহমত (BR$_{24}$), নয়াপাইজম (BR$_{25}$), গাজী (BR$_{14}$), মোহিনী (BR$_{15}$) ইত্যাদি। এছাড়াও আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা কেন্দ্রে (IRRI) এবং পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের ধান গবেষণা কেন্দ্রে উচ্চ ফলনশীল অনেক ধান উদ্ভাবিত হয়েছে। যেমন- IR$_5$, IR$_8$ ইত্যাদি।

২। কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধক্ষম উদ্ভিদ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে। উদ্ভাবিত উদ্ভিদগুলো ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক কিংবা কীটপতঙ্গ দ্বারা সহজে আক্রান্ত হয় না।

৩। কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে বন্যা ও খরা প্রতিরোধক্ষম জাত সৃষ্টি করা হয়েছে। বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ বন্যা ও খরায় প্রতি বছর অনেক উদ্ভিদ ও ফসল ধ্বংস হচ্ছে। এতে অর্থনৈতিক ক্ষতি হচ্ছে ব্যাপকভাবে। বন্যা ও খরা প্রতিরোধক্ষম জাত সৃষ্টির মাধ্যমে এসব ক্ষতি থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব।

৪। এ প্রক্রিয়ায় মানুষের চাহিদামতো উন্নত জাতের ফলন সম্পন্ন যেমন বড় আকার, সুগন্ধি, আকর্ষণীয় বর্ণের এবং রন্ধনগুণসম্পন্ন ইত্যাদি উদ্ভিদ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে।

৫। কৃত্রিম প্রজনন ঘটিয়ে সৌন্দর্য্যপ্রিয় ফুল সৃষ্টি করে মানুষের সৌন্দর্য পিপাসু মনকে পূর্ণ করা সম্ভব হয়েছে।

৬। কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে অধিক অভিযোজন ক্ষমতাসম্পন্ন উদ্ভিদ সৃষ্টি করে যে কোনো পরিবেশেই জন্মানো সম্ভব হচ্ছে।

৭। মাঠে অনেক সময় অনেক ফসল একই সময়ে পরিপক্ব হয় না ফলে ফসল সংগ্রহ করা খুবই অসুবিধা হয়। কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে একই সময় পরিপক্বতাসম্পন্ন উদ্ভিদ সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে।

৮। পলিপ্লয়ডির মাধ্যমে বীজহীন কলা, আঙ্গুর, আপেল ও তরমুজ আবিষ্কৃত হয়েছে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে।

এভাবে বর্তমানে অনেক উন্নত ফলনশীল শাক সব্জি, বীজ ও ফল সংকরায়নের মাধ্যমে কৃত্রিমভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	নিচের ছকে উন্নত প্রকৃতির পাঁচটি ধানের জাতের নাম লিখুন			

সারসংক্ষেপ

কৃত্রিম প্রজননের অর্থনৈতিক গুরুত্ব অপরিসীম। এর মাধ্যমে সৃষ্টি করা হয়েছে অসংখ্য উন্নত ফলনশীল ফসল। উন্নত ফলনশীল প্রকরণগুলোর অধিকাংশই রোগ ও খরা প্রতিরোধক্ষম। প্রতি বছর পৃথিবীতে উন্নত ফলনশীল প্রকরণগুলোর কারণে লক্ষ লক্ষ টন ফলন বেড়ে যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১২.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা কেন্দ্রে উদ্ভাবিত ধানের জাত কোনটি ?

(ক) IR_5 (খ) BR_{15} (গ) BR_{24} (ঘ) BR_{25}

২। বিরি (BRRI) উদ্ভাবিত জাতগুলো হলো-

i. মুক্তা ii. নয়া পাইজাম iii. গাজী

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii, ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

পিদিম বারিতে (BARI) বেড়াতে গিয়ে কয়েক প্রকার উন্নত জাতসম্পন্ন ধানের কথা শুনলেন এবং বীজগুলো সংগ্রহ করলেন। বাংলাদেশে বর্তমানে উন্নতজাতের ধানের পাশাপাশি অনেক উদ্ভিদের উন্নতজাত উৎপন্ন করার চেষ্টা চলছে।

(ক) অ্যাপোগ্যামি কী ?

(খ) বিরি (BRRI) উদ্ভাবিত ধানের কয়েকটি জাত উল্লেখ করুন।

(গ) উদ্দীপকে উল্লিখিত উন্নত জাতসম্পন্ন ধানের জাত তৈরির পদ্ধতিগুলো প্রবাহ চিত্রে দেখান।

(ঘ) যে কোনো দেশের প্রেক্ষাপটে উল্লিখিত প্রক্রিয়াটির অর্থনৈতিক গুরুত্ব উল্লেখ করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১২.১ : ১। ক ২। গ ৩। ঘ ৪। ক ৫। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১২.২ : ১। ক ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১২.৩ : ১। ক ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১২.৪ : ১। গ ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১২.৫ : ১। ক ২। ঘ